যুগান্তর

09 OCT 2013

বেগম জাহান আরা

মঞ্জুরি কমিশন বনাম উচ্চশিক্ষা কমিশন

দেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। উচ্চশিক্ষার হারও বাড়ছে। সংখ্যা বাড়ছে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠানেরও। বর্তমানে দেশে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭৭টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আরও আছে দেশে পরিচালিত কিছু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। এ বিশাল শিক্ষা কর্মকাণ্ডের মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য আছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। কয়েক বছর থেকেই বলা হচ্ছে, মঞ্জুরি কমিশনের যে কাঠামো ও জনশক্তি বর্তমানে আছে তা অপ্রতুল। তার ওপর আরও ৮-১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রায় অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ভেঙে দিয়ে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন-২০১৩' পাস হতে যাচ্ছে। অবশ্যই সময়োপযোগী ও যৌক্তিক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে সরকার। এমন একটা পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।

পত্রিকান্তরের প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, উচ্চশিক্ষা কমিশন আইনের-২০১৩ (উশিক)-এর খসড়ায় মোট ১৬টি ধারা এবং প্রায় শতাধিক উপধারা আছে। এ কমিশন দেশে পরিচালিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ডও নিয়ন্ত্রণ করবে। বিশেষ করে 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন' এবং 'ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন'-এর কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে দেখভাল করাটা খুব জরুরি ছিল। আমরা আশা রাখছি, দেশী-বিদেশী উচ্চশিক্ষার নামে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে যে ধরনের বিদ্যাবাণিজ্য চালায়, সেক্ষেত্রে লাগাম টেনে ধরবে উশিক। বস্তুতপক্ষে মঞ্জুরি কমিশনের গঠন-কাঠামো ছিল ছোট। কারণ শুধু কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনাই ছিল তখনকার মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্ব। একজন চেয়ারম্যান আর পাঁচজন পূর্ণকালীন সদস্যসহ একদা কাজ চালানো সম্ভব হলেও বর্তমানে তা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে এই প্রায় অসহায় অবস্থাও হালে হয়নি। হুড়মুড় করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুরি কমিশনের বেহাল দশা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়, ভর্তি ফিসহ পাঠের খরচ, ছাত্র ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ, আউট ক্যাম্পাস খোলা, সার্টিফিকেট দেয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকা এবং আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ ইত্যাদি নিয়ে মঞ্জুরি কমিশন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ফলে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেকটাই ব্যাহত হয়। কোনো কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এ-লেভেল পাস করেনি এমন ছাত্রকেও শর্ত দিয়ে ভর্তি করেছে। যেমন, ও-লেভেল পাস করে এ-লেভেলে পড়ছে, সেটা ঠিক আছে। তবে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর একদিকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে, অন্যদিকে এ-লেভেল পাস করে সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে— এতে একদিকে শিক্ষাবাণিজ্য তো হচ্ছেই, অন্যদিকে, কমেছে শিক্ষার মান। ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতাও বিবেচিত হয়নি।

আমি নব্বই-দশকের কথা বলছি। বিদ্যাবাণিজ্যের ব্যবসাটা কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারেনি। এমনকি একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেও এমন ঘটনা ঘটত। বিদেশী অ্যাফিলিয়েশনের কথা বলে, গালভরা নাম রেখে, পকেট ভারি বেতনের কথা বলে, এক বছরের মধ্যে ছাত্রছাত্রীকে বিদেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা ভাড়া বাড়িতে কিছু চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে যেসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারাও টিকতে পারেনি বিদ্যাবাণিজ্যের প্রতিযোগিতায়। এর প্রধান কারণ পঠন এবং শিক্ষাগত অযোগ্যতা। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল 'ওয়ান পার্সন শো'-এর মতো। ভাবটা ছিল, প্রাইভেট-বিশ্ববিদ্যালয় (সেটা যদি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ধে ভোবানো থাকে) প্রতিষ্ঠা করার পর আর ভাবনা নেই। টাকা আসবে উড়ে উড়ে। সেটা হয়নি অনেক ক্ষেত্রে। ঠকেছে শিক্ষার্থীরা, ঠকেছে শিক্ষকরাও। উচ্চশিক্ষার দোকান খোলার অনুমতি দিয়ে ঠকেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও। তখনও তনেছি মঞ্জুরি কমিশন লোকবলের অভাবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ঠিকমতো করতে পারে না। হতেও পারে। নাও পারে। মন্দ লোকে বলত, 'আন্ডারহ্যান্ড' কারবারও থাকত। তাই উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের কথায় আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি।

নতুন উচ্চশিক্ষা কমিশনের গঠন-কাঠামো বেশ বড় হবে বলে জানা যায় প্রতিবেদনের বরাতে। এখানে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান, ৫ জন পূর্ণকালীন সদস্য, ১২ জন খণ্ডকালীন সদস্য। খণ্ডকালীন সদস্যদের মধ্যে ৩ জন সচিব (শিক্ষা, পরিকল্পনা ও অর্থ); পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্যে ৩ জন; প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্যে ৩ জন; পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও তিনজনের মধ্যে ৩ জন। খণ্ডকালীন সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হবে ২ বছর। পূর্ণকালীনদের মেয়াদ হবে ৪ বছর। কমিশনের চেয়ারম্যান পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

উচ্চশিক্ষা কমিশন ২০১৩-এর প্রস্তাবিত আইনে কমিশনের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে : ১. কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করবে, ২. আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রেডিট ট্রান্সফার করবে, ৩. ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক বিনিময় কর্মসূচি পরিচালনা করবে, ৪. দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে, ৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোনো বিভাগ-অনুষদ-প্রোগ্রাম-কোর্স-ইন্সটিটিউট চালু করার জন্য ন্যূনতম শর্ত নির্ধারণ করবে, ৬. শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করবে, ৭. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলোর শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ এবং পদোন্নতি বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রণয়ন করবে, ৮. একাডেমিক বিষয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়ন, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণে পরিদর্শন করতে পারবে, ৯. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হলে (সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে) কমিশন হস্তক্ষেপ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে, ১০. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড নির্ধারণ করবে, ১১. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকে বিদ্যমান পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি বা সরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ/নিরূপণ সংস্থা বা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা পরামর্শ দেবে (যাযাদি, ২৩.০৯.২০১৩)।

প্রতিবেদনটিতে এ পর্যন্ত পড়তে ভালো লাগছিল। সবই ইতিবাচক কথা। আশা ও অনুমান করে নিই, এগুলোর বাস্তবায়নে সুফল আসবেই। ওই একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন-২০১৩ প্রস্তাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধে কার্যকর কোনো নির্দেশনা নেই। মানে, উশিকের উপদেশ-পরামর্শ বা নির্দেশনা না মানলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রতিবিধানের (শাস্তির) কোনো নির্দেশনা নেই এতে। হায়রে, আমাদের সব ভালো কাজের প্রস্তাবনাই কাগজে নির্দেশনায় পরিণত হয় এই কারণে। পরিবারের সন্তানরাও নিয়ন্ত্রণে থাকে না, যদি ঘরের কিছু আইন-কানুন না থাকে। যদি না নিয়মতন্ত্রের কারণে জবাবদিহিতা এবং কখনও দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকে। এটা কে না বোঝে যে, ঐশীর মতো সন্তান জন্মের পরই এমন হয়ে যায় না! তাহলে উশিকের কথা বা উশিক প্রদত্ত বিধিনিষেধ, শাসন-শৃংখলা শিক্ষাবাণিজ্যের মানুষগুলো মানবে, এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। উশিক গঠনের সময় থেকেই কথাগুলো মনে করিয়ে দিতে চাই আমরা।

দেশের শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী মানুষরাই তো কাজ করবেন উশিকে। মঞ্জুরি কমিশনেও তেমন যোগ্য মানুষই ছিলেন। পদমর্যাদা বাড়ানোটা অবকাঠামোর অলংকার। তবে কাজের ব্যাপারে শাসকের হাতে দণ্ডদানের ক্ষমতা না থাকলে হালকা হয়ে যায় পদমর্যাদার ভার এবং সুযোগ-সুবিধার সুখ। মাঝখান থেকে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে কৌশলী মানুষেরা। শাসকেরা দেখে-বুঝেও কিছু করতে পারেন না। সচেতন আলোড়িত মানুষেরা বোবা হয়ে থাকেন। এমন অবস্থা আমরা চাই না। বিশেষ করে 'ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন' এবং 'ট্রান্সন্যাশনাল এডুকেশন' শিক্ষা ব্যবস্থাটা নাকি বড় নাজুক অবস্থায় আছে। সেখানে আসলে কীভাবে কী হয়, সেটাই শিক্ষিত সমাজ জানে না পুরোপুরি। আমি জানার চেষ্টা করেছি। কেউ সুষ্ঠু উত্তর দিতে পারেননি। হয়তো জানেনও। যারা এমন বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত তারা জানেন, দেখাশোনার জন্য কেউ কোথাও নেই। পথে চলার সময় কত রকম ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক এবং অজস্র নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড দেখা যায়। মনে হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবা প্রতিষ্ঠানের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সবখানেই টাকার ছড়াছড়ি। মেধার প্রয়োজন নেই, লাখ লাখ টাকা দিতে পারলেই নাকি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া যায়। এসব তো পত্রিকাগুলোরই খবর। নইলে আমরা জানব কোথা থেকে? উশিক যদি 'শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলি নির্ধারণ' করে দেয়, তাহলে যথার্থ অর্থেই উচ্চশিক্ষার গুণগতমান একটা স্থির লক্ষ্যের দিকে যাবে। আমরা সেটাই চাই। প্রভূত সম্পদ ও সম্ভাবনার বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে চাই প্রকৃত অর্থে। এ দেশে নেই কী? শুধু সাজিয়ে নেয়াটাই কাজ। আমরা তাকিয়ে আছি তা দেখার জন্য।

হুড়মুড় করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুরি কমিশনের বেহাল দশা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়, ভর্তিফিসহ পাঠের খরচ, ছাত্র ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারণ, আউট ক্যাম্পাস খোলা, সার্টিফিকেট দেয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকা এবং আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ ইত্যাদি নিয়ে মঞ্জুরি কমিশন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ফলে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেকটাই ব্যাহত হয়।

ড. বেগম জাহান আরা : নেক্সট বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, গবেষক